রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ

রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ*

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর "টপ্পা" এক কালে এই দেশে যথেষ্ট আদৃত ছিল। নিধুবাবুই যে এই শ্রেণীর গান বাঙ্গালায় প্রথম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইতে পারে, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার "বাঙ্গালার শোরি মিঞা" এই গৌরবাস্পদ আখ্যা একেবারে নিষ্ফল নহে। আধুনিক রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে নিধুবাবুর গানের আর সেরূপ আদর দেখা যায় না, তথাপি গান হিসাবে ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে এই গানগুলির মূল্য যথেষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

নিধুবাবুর গানসমূহের বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তদ্রচিত "গীতরত্ন গ্রন্থ" ১২৪৪ সালে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়। ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাগারে আছে[১]। ইহা নিধুবাবুর রচিত সমস্ত টপ্পার সংগ্রহ বলিয়া প্রচারিত। ইহার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে—সেটি গ্রন্থকারের নিজের রচনা বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে উক্ত গ্রন্থ আবার "তদাত্মজ[২] জয়গোপাল[৩] গুপ্ত" কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত[৪] হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়; এ পুস্তকখানি তৃতীয় সংস্করণ[৫]। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বোধ হয়, ১২৫৭ সালে প্রকাশিত

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ইহার পত্রসংখ্যা।৶,+১৪১। পরিষদ্গ্রন্থাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহার ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠা নাই। ইহার টাইটেল পেজ বা পরিচয়-পত্র এইরূপ—শ্রীশ্রীরামঃ ॥ / শরণং / গীতরত্ন / গ্রন্থ / শ্রীরামনিধি গুপ্ত / রচিত / গৌড়িয় সাধুভাষায় নানা প্রকার ছন্দে / রাগ রাগিনী সহিত শঙ্কোলিত হইয়া / সন ১২৪৪ শালে / কলিকাতা বিদ্যোদ প্রেষে / মুদ্রিত হইল ॥ / এই পুস্তক শোভাবাজারের ৺নন্দরাম সেনের / ইষ্ট্রিটে নং ২০ বাটিতে অন্বেষণ করিলে পাইবেন। /

২। *Bengal Academy of Literature* (Vol I. No 6. p. 4)এ জয়গোপাল গুপ্তকে ভ্রমক্রমে নিধুবাবুর অনুজ বলা হইয়াছে।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে জয়গোপালকে ভ্রমক্রমে জয়চন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪। এই জীবন-বৃত্তান্ত জয়গোপাল-লিখিত নহে, প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সঙ্কলিত। কেবল উল্লিখিত জীবনীতে "পক্ষীর দল" ও আখড়াই গাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৫। ইহার টাইটেল পেজ এইরূপ—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। / গীতরত্ন গ্রন্থঃ। / ৺রামনিধি গুপ্ত প্রণীত। / কবিতা সমূহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত / তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / তৃতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা। / এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত। / সং ৯১ আহীরীটোলা। / ১২৭৫। / মূল্য এক টাকা চারি

হয়, কিন্তু ইহা আমাদের অধিগত হয় নাই। উল্লিখিত তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জয়গোপাল গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কবিবর ১২৪৪ সালে তাঁহার রচিত গীতগুলি গীতরত্ন নাম দিয়া প্রথম বার মুদ্রিত করেন; বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত প্রথম মুদ্রাঙ্কণ উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে। এই সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের অবিকল মিল আছে, পত্রাঙ্কও প্রায় একরূপ; কেবল ইহাতে নিধুবাবুর কিঞ্চিৎ জীবনী, সাতটি আখড়াই সঙ্গীত, একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, একটি শ্যামাবিষয়ক গীত ও একটি বাণী-বন্দনা বেশী দেওয়া আছে।

এই গীতরত্ন গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। ইহাও বটতলা হইতে ১২৫৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহাও তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে লেখা আছে যে, "এই গীতরত্ন গ্রন্থ যাহা রামনিধি গুপ্ত কর্ত্তৃক অশক্তাবস্থায় ও বিস্তর অশুদ্ধ সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য দ্বারা সুধাসিন্ধু-যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল।" ইহাতে বহুসংখ্যক আদিরসাত্মক গান আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি গীতরত্ন ভিন্ন অপর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, এবং নিধুবাবুর গানের সহিত অন্যান্য লোকের রচিত বিস্তর টপ্পাও মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২৫২ সালে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর তাঁহার "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে" বাঙ্গালা ভাষার গান মুদ্রিত করেন৬। তাহাতে নিধুবাবুর রচিত সার্দ্ধশতাধিক গান স্থান পাইয়াছে। ইহার গানগুলি অধিকাংশ গীতরত্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং গীতরত্নের ধারানুসারে গান বিন্যাস করা হইয়াছে; কেবল আখড়াই সঙ্গীতগুলি শেষে না দিয়া গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে।

১২৯৩ সালে আশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট হিন্দু-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" বা "কবিবর নিধুবাবু-রচিত গীতাবলী" পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় ১৬০ গান আছে; কিন্তু গ্রন্থের কাটতি সম্ভাবনায় নিধু-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ গীত অপরাপর ব্যক্তির রচিত এবং নিধুবাবুর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে।

আধুনিক সময়ে বটতলা হইতে বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা সমেত "গীতাবলী" বা "নিধুবাবুর (৺রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীতসংগ্রহ" পুস্তকে উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ হইতে নিধুবাবুর পদ উদ্ধার করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া লিখিত আছে; ইহার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখি নাই। তারিখ ১৩০৩।

আনা মাত্র।/ ইহার পত্রসংখ্যা ২+১।০+১৪৮ (১৪০ পৃঃ পর্য্যন্ত টপ্পা। ১৪১—১৪৮ পৃঃ আখড়াই ও ব্রহ্ম-সংগীতাদি)।

৬। সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের বঙ্গাংশ বা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪—৩১২ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত সংগ্রহগুলি ছাড়া কতকগুলি বিবিধ বাঙ্গালা সঙ্গীতসংগ্রহে নিধুবাবুর অনেকগুলি গীত চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত-সারসংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ (১৩০৬), বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত ভূমিকাসম্বলিত "রসভাণ্ডার" (১৩০৬), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত "প্রীতি-গীতি" (১৩০৫), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড (ইং ১৯১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল সংগ্রহে মুদ্রিত অধিকাংশ গীতাবলী নূতন করিয়া সংগৃহীত নহে, উল্লিখিত গীতরত্ন প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

নিধুবাবুর টপ্পার এই সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে গীতরত্ন গ্রন্থখানিকে আদি ও প্রামাণিক ধরা যাইতে পারে। কিন্তু গীতরত্নের মধ্যেই এমন অনেক গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গীতরত্ন গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায়[৭] নিম্নলিখিত গানটি দৃষ্ট হইবে,—

এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

কিন্তু তারাচরণ দাস-রচিত "মন্মথ-কাব্য"এর ৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়,—

এই কি তোমার সই ছিল রে মনে।
জাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥ হে
চিত্রা কি চিত্রে চিত্রে দহিলে কেনে।
যে চিত্র করিলে কোথা পাব সে জনে॥[৮]
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

উদ্ধৃত গানেতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু অন্য অনেক গানে উভয় পুস্তকে অবিকল ঐক্য দেখা যায়। যথা,—গীতরত্ন ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রবলপ্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হলে" মন্মথকাব্যের ৫৯ পৃষ্ঠায় অবিকল পাওয়া যায়। এইরূপ মন্মথকাব্যের প্রায় ২১টি গান গীতরত্নে দেখা যায়।

বটতলা-প্রকাশিত নিধুবাবুর "গীতাবলী"র ভূমিকায় ও "মন্মথ-কাব্যে"র ১২৬৯ সালে

৭। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতরত্ন গ্রন্থের যে পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ আছে, তাহা (অন্য সঙ্কেত না থাকিলে) তৃতীয় সংস্করণের পত্রাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

৮। এই দুই পংক্তি গ্রন্থ-বর্ণিত মন্মথুঞ্জরির মনমোহনের চিত্রপট দর্শন প্রসঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সময়ে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্যে যে সকল গীতের ঐক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় মন্মথকাব্য-প্রণেতা তারাচরণ দাসের রচনা। কারণ, তারাচরণ দাস রাজা নবকৃষ্ণের সমকালীন ও তদাজ্ঞায় প্রণীত মন্মথ-কাব্য প্রায় এক শত বৎসরের অধিক হইল রচিত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "রামনিধি ১২৪৬ সালে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে যদি স্বয়ং গীতরত্ন ছাপাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গীতের খাতাতে অপরের রচিত যে সকল উত্তমোত্তম গীত উদ্ধৃত ছিল, তাহা তিনি অশক্তাবস্থাপ্রযুক্ত সংশোধন ও নির্ব্বাচন না করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন।" এই মতের বিরুদ্ধে দুএকটি আপত্তি আছে। প্রথমে দেখিতে হইবে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্য, ইহার কোনখানি অপরটির পূর্ব্বে রচিত। আমরা পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে একখানি মন্মথ-কাব্য পাইয়াছি, তাহার টাইটেল পৃষ্ঠা বা মুদ্রণ-তারিখ নাই। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা আছে,—

শাকে যুগ্মরসাব্রিচন্দ্রবিমিতে লেয়ে গতে পুষণি
পক্ষে নন্দসুতস্য নামমিলিতে বারে বিধৌ বাণতিথৌ
বাবু শ্রীনবকৃষ্ণদাসকৃপায়ামারাখ্য কাব্যং শুভং
শ্রীতারাচরণাভিধেয়রচিতং সম্পূর্ণতামাপিতং ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, মন্মথ-কাব্যের রচনা ১৭৬২ শকে অথবা ১২৪৭ সালে বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমাপ্ত হইল। যদি মন্মথকাব্য ১২৪৭ সালে রচিত হয়, তাহা হইলে গীতরত্নের ৩ বৎসর পরে ইহার রচনা-সমাপ্তির কাল। উপরোদ্ধৃত শ্লোকে ও গ্রন্থের সর্ব্বত্র "বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়" এইরূপ ভণিতা আছে; কুত্রাপি রাজা নবকৃষ্ণ বলা হয় নাই। গ্রন্থকার যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সেখানেও বলিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়। মনমথ কাব্য রচি ভাবি শারদায়॥" (পৃঃ ৭)। নবকৃষ্ণের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বাবু নবকৃষ্ণ ও শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ যে এক ব্যক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তার পর নবীনবাবু নিধুবাবুর অশক্তাবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সংবাদ-প্রভাকরে নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গীতরত্নের প্রারম্ভে পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও অবশিষ্ট সময় নানাবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকপাঠে কাটাইতেন।[৯] নিধুবাবু স্বয়ং গীতরত্নের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি উক্ত

৯। গীতরত্ন, পৃঃ ৸৹ ; সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১।

গ্রন্থ প্রকাশের সময় সবিশেষ সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তারাচরণকৃত এক আধটি নহে—একুশটি গান যে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা অনবধানবশতঃ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় যে, আলোচ্য গানগুলি নিধুবাবুরই রচিত; তারাচরণ স্বীয় কাব্যের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধির জন্য সেগুলি নিজের রচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শুধু মন্মথ-কাব্যে নহে, এইরূপ বনওয়ারীলাল-প্রণীত "যোজনগন্ধা", মুন্সী এরাদোত-প্রণীত "কুরঙ্গভানু" (১২৫২) প্রভৃতি কাব্যে গীতরত্নের অনেকগুলি গান চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল কাব্যে দুএকটি এমন গান উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। যথা—মন্মথকাব্যে উদ্ধৃত (পৃঃ ১২০) "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন"[১০] গানটি নিধুবাবু তাঁহার প্রথম স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধ, এবং জয়গোপাল গুপ্তের সঙ্কলিত জীবনীতেও এই কথা আছে। বোধ হয়, নিধুবাবুর টপ্পা তৎকালে এরূপ বিখ্যাত ও সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, তাহা স্বীয় গ্রন্থে তুলিয়া দিতে কোনও গ্রন্থকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; আধুনিক সময়েও এইরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বিখ্যাত গান বিবিধ নাটক নভেলে "কোটেশন" চিহ্ন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিধু বাবু তাঁহার জীবদ্দশাতেই গীতরত্ন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। সুতরাং উক্ত পুস্তক যে তাঁহার টপ্পার আদি ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংগ্রহ, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দররূপ ব্যক্ত থাকাতে কোনমৎ প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না। এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপূরিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আসঙ্কাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আপ্ত বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিরদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল।" অবশ্য গীতরত্নে অনবধান প্রযুক্ত অপরের দুএকটি গান আসিয়া পড়ে নাই অথবা নিধু বাবুর দুএকটি গান যে বাদ পড়ে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পরবর্ত্তী সকল সংগ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ।

বাস্তবিক প্রাচীন কবিগান বা টপ্পা-লেখকদের রচনা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বা বিশুদ্ধরূপে সংগৃহীত হয় নাই; এরূপ সংগ্রহের বোধ হয় বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। কোন্‌টি কাহার পদ,

১০। গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯।

তাহা নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এবং অনেক গান এক বা ততোধিক রচয়িতার নামে এরূপ চলিয়া আসিতেছে যে, এত কাল পরে তাহা প্রকৃত কাহার রচনা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উদাহরণস্বরূপে এই গানটি—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

একাদিক্রমে শ্রীধর কথক, রাম বসু ও নিধু বাবুর বলিয়া বিবিধ সংগ্রহে দেখা যায়। ইহা খুব সম্ভব, প্রথমোক্ত ব্যক্তির রচনা। গীতরত্ন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু গীতরত্নে যে নিধু বাবুর সমস্ত গান আছে, তাহাও বোধ হয় বলা যায় না। "নয়নেরে দোষ কেন। মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন। আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন॥" অথবা "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" প্রভৃতি গান নিধু বাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং "সঙ্গীতসারসংগ্রহ" (পৃঃ ৮৭৫ ও ৮৫১), "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ১৫৩ ও ১২৭), "রসভাণ্ডার" (পৃঃ ১০৭) প্রভৃতি সংগ্রহে নিধু বাবুরই বলিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু গীতরত্নে একেবারে পরিত্যক্ত হওয়াতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, এগুলি প্রকৃতই নিধু বাবুর কি না। এইরূপ "তবে প্রেমে কি সুখ হত। আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥" ইত্যাদি সুন্দর গানটি "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ৩৭৬) ও "নিধু বাবুর গীতাবলী" (পৃঃ ১৭২) প্রভৃতি পুস্তকে নিধু বাবুর বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু অনেকের মতে ইহাও শ্রীধর কথকের রচিত এবং গীতরত্নেও ইহা পরিত্যক্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। টপ্পা রচনায় নিধু বাবুর এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী অনেক টপ্পা তাঁহার রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমে" (পরিষৎ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪) "ককারে আকার জুর ছাড়ি লয়ে দীর্ঘ ঈকার বল" শীর্ষক উদ্ভট গানটি নিধু বাবুর গীতের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী রামলোচন ঘোষের পুত্র "গীতাবলী"-প্রণেতা আনন্দনারায়ণ ঘোষের রচনা এবং উক্ত গানের শেষে তাঁহার নামের এইরূপ ভণিতা আছে,—"আনন্দের নিবেদন মন দিয়া শুন মন" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ১৪৮) আছে; কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের অতিরিক্ত গানের মধ্যে, প্রথম সংস্করণে নয়। আশুতোষ ঘোষাল-সংগৃহীত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" দ্বিতীয় খণ্ডে নিধু বাবুর যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীধর কথক, কালী মির্জ্জা, ছাতু বাবু প্রভৃতি অপরাপর লোকের বিস্তর গান মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরাগে রচিত "কেন রে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন" গানটি "গায়নহৃদকুমদ"[১১] ২৩ পৃষ্ঠায়

১১। গায়নহৃদকুমদ বিভিন্ন লোকের রচিত কবিতার সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহা বংশীধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বটতলা হইতে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

দৃষ্ট হইবে ; সমস্ত গীতরত্নে নিধু বাবুর শ্রীরাগের গান নাই। কিন্তু গায়নকল্পদ্রুমদের (পৃঃ ২৪) "দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন" গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ২৭) পাওয়া যাইবে। "সঙ্গীত-সারসংগ্রহে" (পৃঃ ৮৭৪), বটতলা-প্রকাশিত "নিধু বাবুর গীতাবলী"তে (পৃঃ ১৭২), এবং অনাথকৃষ্ণ দেবের "বঙ্গের কবিতা"য় (পৃঃ ২৯৪)

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
আমি এই মাত্র চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থাক এ দেহে সকলি সবে॥

গানটি নিধু বাবুর বলা হইয়াছে ; কিন্তু ইহা জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক-রচিত[12] এবং গীতরত্নে বর্জ্জিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি এইরূপ—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে দেহে প্রাণ না রহিবে॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান পলকে নিশ্চিত প্রাণ
অবশ্য অন্তর হলে প্রলয় হইবে তবে॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই আমি মাত্র এই চাই
তুমি সুখে থাক মম শব দেহে সব সবে॥

এমন কি, "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা"র (পৃঃ ৪০) "পিরীতি পরম রতন" শীর্ষক যে গানটি নিধু বাবুর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত পদ্মাবতী নাটকে দেখা যায়! এই সমস্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন কবি বা গীতরচকদিগের পদাবলী বিশুদ্ধরূপ উদ্ধার বা নির্ব্বাচন করা কি প্রকার কষ্টসাধ্য। তথাপি গীতরত্ন গ্রন্থ যখন নিধু বাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এত কাল তাঁহার আদি ও প্রামাণিক গীত-সংগ্রহ[13] বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহাকেই তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ ধরিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।[14]

১২। প্রীতি-গীতি, পৃঃ ৪৮১।

১৩। পরিষৎ-প্রকাশিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের ভূমিকায় (পৃঃ ৪) উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হিন্দী ও বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় রামনিধি গুপ্তকৃত "গীতাবলী"র উল্লেখ আছে ; ইহার দ্বারা বোধ হয়, গীতরত্নই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

১৪। গীতরত্নে যে নিধু বাবুর অনেকগুলি গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা তৎপুত্র জয়গোপাল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—"অনেকে কহিয়া থাকেন যে যে সকল কবিতা লোকে নিধু বাবুর বলিয়া শুনাই-য়াছে এবং যে সকল কবিতা আমরা জ্ঞাত আছি সে সকল কবিতা এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে যে সকল গীত তাঁহার বলিয়া মহাশয়েরা জানেন এবং যাহা তাঁহার বলিয়া শুনায় সে সকল তাঁহারি গীত বটে কারণ তাঁহার গীত অসংখ্য, সে গীত সকলের আদর্শ রাখা হয় নাই বলিয়া ইহার ভিতর সন্নিবেশ হয় নাই, আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোক পরম্পরায় মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এই ক্ষণে সংগ্রহ কিম্বা সংশোধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অশুদ্ধ পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে [illegible] [illegible] হইল। ইহাতে মহাশয়েরা ক্ষোভিত হইবেন না।" (গীতরত্ন, পৃঃ ৸৶৹)

এই ত গেল নিধু বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে। তারপর নিধু বাবুর জীবনবৃত্তান্ত। রামনিধি গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা শুধু ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে লিখিত জীবনী হইতে। গীতরত্নের তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যে জীবন-বৃত্তান্ত আছে, তাহাও প্রভাকর হইতে সঙ্কলিত। এই সমস্ত স্থল হইতে সারাংশ লইয়া রামনিধির জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতা কুমারটুলীতে। এই পৈতৃক বাটী নন্দরাম সেনের গলিতে অবস্থিত; নিধুবাবুর উত্তরাধিকারীরা এখনও সেখানে বাস করিতেছেন। নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ বর্গীর হাঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১১৫৪ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানেই নিধুবাবুর বিদ্যাশিক্ষা হয়। সংস্কৃত ও পারস্য ভিন্ন তিনি কোনও পাদরী সাহেবের নিকট কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৯)। রামনিধি ১১৬৮ সালে সুখচর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন এবং ১১৭৫ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান লাভ করেন। অনন্তর ৩৫ বৎসর বয়সে[১৫] নিধুবাবু নিজ পল্লীবাসী ছাপরা কালেক্টারের দেওয়ান রামতনু পালিতের আনুকূল্যে উক্ত কালেক্টারীতে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে পালিত মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন জনাই গ্রামবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন এবং নিধুবাবু তাঁহার কেরাণীগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ছাপরায় অবস্থানকালে নিধুবাবু অবকাশমত সঙ্গীত-বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনৈক যবন গায়কের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। যখন ঐ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল, তখন তিনি ওস্তাদের শিক্ষাদানে কার্পণ্য বুঝিতে পারিয়া যাবনিক গীতশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, আপনিই হিন্দী গীতের আদর্শে রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া বঙ্গভাষায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার বাঙ্গালায় টপ্পা রচনার সূত্রপাত। প্রায় ১৮ বৎসর[১৬] ছাপরায় কর্ম্ম করিবার পর উৎকোচাদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে দেওয়ান জগন্মোহনের সহিত মতান্তর হওয়াতে সদাচারনিষ্ঠ রামনিধি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটি ও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে নিধুবাবু শোকাকুল হইয়া "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন" (গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯) ইত্যাদি গান রচনা করেন। তদনন্তর ১১৯৮ সালে জোড়াসাঁকোতে নিধুবাবু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে সংসার অতি শীঘ্রই গত

১৫। *Bengal Academy of Literature*, Vol I. no 6. p. 4.

১৬। *Bengal Academy of Lit. ibid.* যদি ইহা ঠিক হয়, তবে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমনের তারিখ ১২০১ বা ১২০২ হয়; কিন্তু তাহা হইলে তিনি ১১৯৮ সালে কিরূপে কলিকাতায় দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন ?

হইয়াছিল। ১২০১ বা ১২০২ সালে বরিঝাটি চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেনের তৃতীয়া কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। এই সংসারে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গীতরত্ন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক।

শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে[১৭] একখানি বড় আটচালা ছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ নিধুবাবু প্রতি রজনী তথায় গিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন এবং সহরের প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার টপ্পা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। নিমতলানিবাসী নারায়ণচন্দ্র মিত্র-গঠিত "পক্ষীর দলের"ও উক্ত আটচালায় বৈঠক বসিত। এই পক্ষীর দলে সকলে গঞ্জিকা-সেবী হইলেও ভদ্রসন্তান, উপস্থিত-কবি ও সৌখীন-নামধারী বাবু ছিলেন এবং নিধুবাবুকে তাঁহারা যথেষ্ট মান্য করিতেন[১৮]। বটতলার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটীতে কিছু দিন নিধুবাবুর বৈঠক হয়। নিধুবাবু পেশাদারী গায়ক বা কবিওয়ালা ছিলেন না, তথাপি তাঁহারই উদ্যোগে ১২১২-১৩ অব্দে[১৯] দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। বাগবাজার-নিবাসী মোহনচাঁদ বসু সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ-আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন; মোহনচাঁদ আখড়াই গাহনা নিধুবার নিকট শিক্ষা করেন।[২০]

উক্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, নিধুবাবু সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ, ও পরোপকারী ছিলেন। যদিও তিনি নিজ গুণে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও কোনও বড় লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে, কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুএকটি অপবাদ ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মুরসিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বহু দিন অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদপ্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা ছিল, এই বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত

১৭। প্রভাকরে প্রকাশিত জীবনী হইতে জানা যায় যে, এই আটচালা শোভাবাজারস্থ বটতলানিবাসী এমেরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছদ্দি রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

১৮। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ সংবাদ-প্রভাকরে দ্রষ্টব্য।

১৯। ১২১১ সাল (প্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১)।

২০। গীতরত্ন, বিজ্ঞাপন, পৃঃ ৬৵০। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিধুবাবুর টপ্পার কথা বলিয়াছি, আখড়াই গান সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করি নাই। আখড়াই গাহনার বিবরণ ও ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত নিধুবাবুর জীবনীতে পাওয়া যাইবে। (সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র, ১২৬১)।

ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাঁহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীয় অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন, তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্যপরিহাস কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক ২ গীত রচনা করিতেন, এবং সেই গীত সকল রাগে এবং সকল তানে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত এই রাগে উদ্ভব হইয়াছে।" (গীতরত্ন, পৃঃ ll০, সংবাদ-প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১)। এইরূপ সুখ ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিয়া প্রায় ৯৭ বৎসর বয়সে, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ সালে, নিধুবাবু দেহ ত্যাগ করেন। শেষ বয়সে অনেক শোকতাপ পাইলেও তিনি শারীরিক নিয়ম এত যত্নের সহিত পালন করিতেন যে, আমরণ সুস্থ শরীরে কাটাইয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল।

তাঁহার রচিত গানে কেবল সঙ্গীতকুশলতা নহে, অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত, পারসী ও অল্প অল্প ইংরাজীও জানিতেন। অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক ; যথা—

> মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন
> গাও এমন কল্যাণ।
> নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পুর,
> ভুরু আম্রশাখা তাহে বাধান ॥
> কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুর শ্বাস, হয় ত বিধান।
> কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
> যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১)[২১]

ভারতচন্দ্রের ন্যায় পারস্য হইতে ভাব আহরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। "প্রীতি-গীতি"র সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন[২২] যে, নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

> ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।
> স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বল না আমারে ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৫৫)

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, নিধু বাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দী টপ্পায় পাওয়া যায়।

আধুনিক সময়ে অনেকের ধারণা আছে যে, আদিরসাত্মক প্রণয়-সঙ্গীত মাত্রই টপ্পা এবং

২১। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত গানগুলিতে মূলের বানান ও পংক্তিবিন্যাস অবিকল রাখা হইয়াছে।

২২। প্রীতি-গীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ২l৶০।

আদিরস অর্থে এখানে হীন ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বিকাশ বুঝায়; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালা শব্দকোষে "টপ্পা" হিন্দী শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহার মৌলিক অর্থ "লম্ফ" এবং টপ্পা গীতের অর্থ "সংক্ষিপ্ত লঘুপ্রকৃতি গীত" দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, টপ্পা ধ্রুপদ খেয়ালের ন্যায় গীত-রচনার রীতিবিশেষ। কোনও বিশেষজ্ঞ লেখক এই রীতির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—"টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ; তাহা হইতে রূঢ়ার্থ, সংক্ষেপ; অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক; অস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। টপ্পাতে প্রাচীন রাগের মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, এবং কালাংড়া আর আধুনিক রাগের মধ্যে কাফী, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া, ইমন, ও লুম ব্যবহৃত হয়। আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। গানের এক পৃথক্ রীতির নাম টপ্‌পা; ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।"২৩

নিধুবাবু যখন টপ্পা গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন এক দিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব, অন্য দিকে কবিগানের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ যদি ১১৬৭ হয়, তবে সে সময় নিধু বাবু উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক মাত্র। ভারতচন্দ্রের নাম ও প্রভাবের মধ্যেই তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা। এই প্রভাবের জের "কামিনীকুমার", "চন্দ্রকান্ত" প্রভৃতি বিদ্যাসুন্দর ধরণের বিকৃতরুচি কাব্যের ভিতর দিয়া ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মদনমোহনের "বাসবদত্তা"য় প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দিকে রাসু, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারা সকলেই নিধু বাবুর সমসাময়িক। আধুনিক সময়ের ধারণা যে, কবিগান খেউড়, উহা অশ্লীলতা-ময়। কবিগানের বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু বস্তুতঃ আদৌ কবিগান সেরূপ ছিল না; রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অন্যান্য পুরাতন জিনিষের ন্যায় যখন কবিগানের আদর কমিয়া গেল, তখন এই শ্রেণীর গীতিও শিক্ষিত-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতর-সমাজে উপনীত হইয়া খেউড়ে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা হউক, কবিগান তখন খেউড় না হইলেও ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় পুরাতন সাহিত্যের জের মাত্র। বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত কবিগানের প্রধান অঙ্গ ছিল এবং এই হিসাবে ইহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অভিনব শাখা মাত্র। যদিও বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় সকল কবিওয়ালাদের প্রতিভা ও তন্ময়তা ছিল না, তথাপি নানা কারণে কবিগানকে বৈষ্ণব-গীতির এক নিম্নতর সংস্করণ ধরা যাইতে পারে। নিধু বাবু পুরাতন

২৩। "সঙ্গীততানসেন" গ্রন্থে (১২৯৯) গীতের দুই প্রকার রীতি কথিত হইয়াছে—ধ্রুপদ ও রঙ্গীন গান। ধ্রুপদ গান প্রায় ২৫ প্রকার ও রঙ্গীন গান প্রায় পঞ্চাশ প্রকার উক্ত হইয়াছে। খেয়াল ও টপ্পা রঙ্গীন গানের একটি বিশেষ প্রকার মাত্র। (পৃঃ ৬৬-৬৯)। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে নিধুবাবুর টপ্পা বাঙ্গালা রঙ্গীন গানের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্যের এই দুই পথের কোনও পথ অবলম্বন করেন নাই। তখন ভারতচন্দ্রের যেরূপ প্রতিপত্তি ও কবিগানের যেরূপ আদর, তাহাতে নিধু বাবুর ভারতচন্দ্রের বাতাস অতিক্রম করা বা কবিগান রচনা না করিয়া নূতন ধরণের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে। তখনকার গীতি-সাহিত্যে নিধু বাবু সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। এক দিকে বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ, অন্য দিকে কবিগান ইত্যাদি, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া নিধু বাবু হিন্দী খেয়াল ও টপ্পা ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় নূতন ধরণের প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত গানই প্রেম-বিষয়ক; কিন্তু তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যা-সুন্দরের নাম-গন্ধও নাই। কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি, ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীন-ভাবে গাহিয়াছেন, পরকীয় ভাব অবলম্বন করেন নাই। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে নিধু বাবুর স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মোটামুটি ধরিলে প্রাচীন সাহিত্য বহির্জ্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত; কবি আপন অনুভূতি বা অন্তর্জ্জগতের কথা বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহা আবার পরের অনুভূতির ভিতর দিয়া। আধুনিক সাহিত্য অল্প-বিস্তর অন্তর্জ্জগৎ লইয়া; আপনার সুখ-দুঃখের কথা অথবা আত্মপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরের কথা বোঝা, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। পুরাতন ভাষা ও কাঠামো বজায় রাখিলেও নিধু বাবু তাহার মধ্যে যেটুকু নূতন ভাবের আলোক আনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন। গীতরত্নের সমস্ত গান রত্ন না হইলেও আধুনিক সময়ে যেরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত, তাহারা বোধ হয় সেরূপ উপেক্ষা ও অনাদরের যোগ্য নহে।

বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, আধুনিক সময়ে এরূপ শক্তিশালী কবির সম্যক্ গুণ গ্রহণ করা হয় নাই; বরং তাঁহাকে উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাগই বেশী দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি দুএক জন গুণজ্ঞ সমালোচক তাঁহার সুখ্যাতি করিলেও নিধু বাবুর গানের সহিত একটা কালক্রমাগত অযথা অখ্যাতি জড়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দেখিতেছি যে, মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় রসজ্ঞ লেখকও "অতি নীচ শ্রেণীর কবিতার করতোপ" বলিয়া নিধু বাবুর গানের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন।[২৪]

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিধু বাবু নামমাত্রাবশেষ; তাঁহার টপ্পা অতি অল্প লোকেই পড়েন এবং অনেকে না পড়িয়াই ঘৃণা করেন। তাঁহারা বলেন, যে লোক জঘন্য অশ্লীল প্রণয়গীত রচনা করিয়া লোকের চরিত্র দূষিত করে, তাহাকে কবি বলিলে কবি নামের

২৪। বঙ্গদর্শন (পুরাতন পর্য্যায়), ৭ম-৮ম ভাগ (১২৮৭-৮৮)। গত বৎসরের নারায়ণ পত্রিকায় 'নিধু গুপ্ত' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় নিধু বাবুর প্রতি সুবিচারে উদ্যত হইয়া এ কথার উল্লেখ করিয়া-ছেন। (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৪)। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পুরাতন মত অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এখন তাহার জন্য দুঃখিত।

অবমাননা হয়। এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া নিধু বাবুর গীত সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" পুস্তিকায় (১২৯২) লিখিয়াছেন,—"ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতাদুষ্ট"। ইহা অপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করিয়া "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, এ সকল সঙ্গীতে যে প্রেমের আদর্শ, তাহা কুৎসিত অসংযত ইন্দ্রিয়-লালসার নামান্তর মাত্র; ইহা "আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র"।[২৬] অবশ্য এরূপ বলা যায় না যে, নিধু বাবুর গানে মোটে অশ্লীলতা নাই; এখনকার মার্জ্জিত রুচি দ্বারা বিচার করিলে তাঁহার কতকগুলি গীত রুচি-বিরুদ্ধ বলিতেই হইবে। কিন্তু আজকালকার ও সে কালের রুচির যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভাশালী হইলেও কবি অনেক সময় সাধারণ লোকের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের অধীন। এরূপ অশ্লীলতা অপবাদ প্রাচীন কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-নাগাদ ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে; কিন্তু এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সমালোচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, নিধু বাবুর গীতাবলীর মধ্যে অশ্লীলতা অত্যন্ত বিরল। দুএকটি টপ্পা, কয়েকটি হাফ আখড়াই ও খেউড় ছাড়িয়া দিলে তাঁহার গানের রুচি সর্ব্বত্র সঙ্গত এবং গানের মধ্যে ভোগ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের কথাই অধিক। নিধু বাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীতও "নিধুর টপ্পা" বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গীতরত্ন গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই এবং নিধু বাবুর গানেরও চর্চ্চা নাই; নিধুর টপ্পা অর্থে আধুনিক পাঠক বুঝেন, বটতলা-প্রকাশিত নিধুর নামে বিক্রীত জঘন্য টপ্পার সংগ্রহ। সেই জন্যই বোধ হয়, নিধু বাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ। বাস্তবিক নিধু বাবুর রচিত টপ্পার মত সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী টপ্পা বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই।

নিধুবাবুর রচনায় কারিগরি বিশেষ না থাকিলেও ভাষার যেমন লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা, সুরলয়ের তেমনি পারিপাট্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও গভীরতা। শব্দের ছটা, ছন্দবৈচিত্র্য বা অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য নাই; এমন কি, চরণের মিল সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অমনোযোগী, তথাপি সাদাসিদে অল্প কথায় স্বভাব-কবির ভাবুকতায় প্রাণের আবেগ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। আর্ট বা শিল্পনৈপুণ্য হিসাবে হয় ত অনেকেই এ গানগুলিকে খুব উচ্চ স্থান দিবেন না; চরণের মিল, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিধুবাবুর রচনা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। অনেকে আবার হয় ত ইহার মামুলী সেকেলে কাঠামো পছন্দ করিবেন না। নিধুবাবুর অতি অল্প গানই আছে, যাহার সমস্তটা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; কবি যে প্রেরণার বশে গাহিতে বসিয়াছেন, তাহা অনেক সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ

২৬। রস-ভাণ্ডার (বসুমতী কার্য্যালয়), ভূমিকা, পৃঃ ৶৹-৶৹।

রাখিতে পারেন নাই। এই দোষ অল্প-বিস্তর অধিকাংশ কবিওয়ালাদের মধ্যেও দেখা যায়। নিত্যানন্দ বৈরাগীর—

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো
সুধা বরিষিলো শ্রবণে।[২৭]

এই মহড়াটি সুন্দর; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অন্তরা ও চিতেন ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। নিধুবাবু হইতেও এইরূপ ক্রমভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

সাধিলে করিব মান কত মনে করি
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১০০)

লাইন দুইটি নিখুঁত; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দুই লাইন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই সকল গীতরচকদিগের রচনা আমূল শেষ পর্য্যন্ত সমভাবাপন্ন বা নির্দ্দোষ নহে। নিধুবাবুর টপ্পায় এ সকল দোষ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, এই সমস্ত টপ্পার ভাব কদর্য্য ও অতি নীচশ্রেণীর অথবা ইহা ভাবসৌন্দর্য্য-বিহীন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারা যায় না। ভাবের মনোহারিত্বাই নিধুবাবুর গানের বিশিষ্টতা।

প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে, নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, নিধুবাবুর মত স্বভাব-কবি পূর্ব্ব হইতে একটা মতামত বা ধারণা খাড়া করিয়া গীত রচনা করিতে বসেন নাই। পরন্তু যখন যে মনের ভাব উদয় হইয়াছে, তাহাই সুর্লয়ে গঠিত করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু সখীসংবাদ, মান, বিচ্ছেদ, মিলন নহে, সহস্রতন্ত্রী হৃদয়-বীণায় প্রেমের কোমল স্পর্শে যে শত সহস্র ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি নিধুবাবুর গানের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেম-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে নূতন নহে; কিন্তু প্রেমের স্বর চিরপরিচিত হইলেও চিরমুগ্ধকর। যুগে যুগে কবিগণ প্রেমের গান গাহিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু এই অপূর্ব্ব অনুভূতির আলোক বিভিন্ন কবি-হৃদয়ের স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া যুগে যুগে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার অন্যান্য মধুর প্রেমসঙ্গীতের সহিত নিধুবাবুর রচনাও গীত-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধুবাবুর প্রেম-সঙ্গীত যে শুধু ইন্দ্রিয়লালসা বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতামূলক নহে, আমরা নিধুবাবুর গীতিগুলি আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রায় সমস্ত টপ্পাগুলিই প্রেম-বিষয়ক। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই প্রীতির প্রশংসা করিয়াছেন; আমাদের কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

২৭। সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৬১, পৃঃ ৭; কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ (ইং ১৮৬২), পৃঃ ১১০-১১১; সঙ্গীতসারসংগ্রহ (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৪৭

পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৭৭)

প্রেমমুগ্ধ কবি প্রেমের কথা বলিতে গিয়া আত্মহারা—

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর সিহরে॥—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

যে প্রেম জানে না, সে সুখীও নয়, দুঃখীও নয়; প্রেমের সুখ-দুঃখই জীবনের প্রধান অনুভূতি—

নহে সুখী নহে দুঃখী প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখী এ রস যে জানে॥—(ঐ, পৃঃ ২১)

কিন্তু প্রেম শুধু ধ্যান-ধারণার জিনিস নহে; হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, তৃষ্ণা তৃপ্তি, পুণ্য পাপ, এ সকলের মন্থন-ধন প্রেম জীবনের একটি বাস্তব অনুভূতি। যত দিন দেহ আছে, প্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না। এইখানেই নিধুবাবুর ধারণার সহিত অনেক আধুনিক কবির ধারণার পার্থক্য। অনেক আধুনিক কবির প্রেম দেহসম্পর্ক-শূন্য স্বপ্নময় কাল্পনিক বস্তু। তাঁহাদের মতে প্রেম ইন্দ্রিয়গত না হইলেও চলে; ভালবাসিবার জন্য আধুনিক কবিগণ একটি কাল্পনিক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু সে কালের কবিগণ ইহাতে তৃপ্ত হইতেন না; এ কালের কবিগণও কোথায় তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন! শুধু একটা দূর মানসী প্রতিমার মিলনের প্রতীক্ষায় না বসিয়া প্রকৃত পৌত্তলিকের ন্যায় হাত-পা-চোখ-মুখ-সম্বলিত একটি জীবন্ত প্রতিমার আরাধনায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। এই পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। এই জন্য তাঁহাদের লেখা শুধু একটা অপরিস্ফুট গীতোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই।

কিন্তু প্রেম দেহ আশ্রয় করিয়া জাগিলেও আবার দেহকে ছাড়াইয়া যায়। সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন যে, প্রেমের প্রথম জন্ম—চোখের নেশায়। এই জন্য রূপ বা আঁখির মিলন কবি ও ঔপন্যাসিকের প্রিয় বস্তু। 'উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তায়।" (গীতরত্ন, পৃঃ ১০৯)। প্রিয় জনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার লালসা প্রেমের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ফল।

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১৯)

অদর্শনে দুঃখ, দর্শনে সুখ। চোখের দেখায় যে সুখ, শুধু ধ্যান-ধারণায় তাহা হয় না—

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি॥—(ঐ, পৃঃ ১২)
নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পূরে॥

যদি বিনয়েতে মনঃ স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে ॥—(গীতরত্ন, ৭৫)
নয়ন-অন্তরে, অন্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে ॥—(ঐ, পৃঃ ৩)
মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে—(ঐ, পৃঃ ৮৭)
মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩)

কিন্তু এ চোখের তৃষ্ণা আর মিটে না—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণ দরশনে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৭)
নয়নে নয়নে রাখি (প্রাণ) অনিমিখ হয় আঁখি
বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি,
কি জানি অন্তর হও অই ভয় দেখি ॥ —(ঐ, পৃঃ ৭৯)

কিন্তু প্রেম রূপের বন্ধনে ধরা পড়িলেও গুণের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে; চোখের নেশায় জন্মিলেও শেষে মনকে আশ্রয় করে—

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে।—(ঐ, পৃঃ ১১৩)
নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥[২৮]—(প্রীতিগীতি, পৃঃ ১৫৪;
রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৭; সঙ্গীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৮৭৫)

চোখের নেশায় প্রেমের সূত্রপাত হইলেও, প্রেম আন্তরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয় ছাড়াইয়া, মনের রাজ্যেই প্রেমের সিংহাসন। সেই জন্য যত দিন নয়ন মনের বশ না হয়—যত দিন প্রেম "নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়" (গীতরত্ন, পৃঃ ৪) না হয়—তত দিন প্রেমের পূর্ণতা লাভ হয় না—

২৮। এই গানটি ও নিম্নোদ্ধৃত তিন চারিটি গান গীতরত্নে নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এগুলি নিধুবাবুর কি না সন্দেহ; কিন্তু বরাবর ইহা নিধুবাবুর নামের সহিত জড়িত; অন্য কাহারো বলিয়া যত দিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয়, তত দিন নিধুবাবুর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতরত্ন প্রামাণিক হইলেও সম্পূর্ণ সংগ্রহ নহে। যেগুলি অন্য লোকের রচিত বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছি। এরূপ সন্দেহযুক্ত গান মোট ৫টি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি; বাকি সব গানই গীতরত্ন হইতে।

এত দিনে মনবশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান॥
বাহ্যে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তার করি দরশন॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৪)

বাস্তবিক একাত্মমিলন না হইলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়—

এত দিন পর নিরিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যত দিন, ছিল দুই জ্ঞান, সদত ঝুরিত আঁখি॥—(ঐ, পৃঃ ৪০)
আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে।
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে॥—(ঐ, পৃঃ ৭)

এরূপ হইলে বিচ্ছেদ-মিলনের আর ভয় থাকে না—

হরিষ বিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন।
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥—(ঐ, পৃঃ ১১৯)

যখন এইরূপ মিলন হয়, তখন প্রেমের আতিশয্যে হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা প্রেমিক নিজেই বুঝিতে পারেন না—

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসি তুমি হয় হে বুঝিতে॥—(ঐ, পৃঃ ৭)
তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানে না॥—(ঐ, পৃঃ ৭৩)

এরূপ আত্মসমর্পণই প্রেমের মূল মন্ত্র—

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন॥—(ঐ, পৃঃ ২০)

প্রতিদানে প্রেমের সার্থকতা বটে, কিন্তু ভালবাসিতে যত সুখ, ভালবাসাইতে তত নয়। এই জন্য নিরপেক্ষ প্রেমের কথা কবিরা গাহিতে ভালবাসেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি　　দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥[২৯]

প্রেম একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহার আর বিনাশ নাই—

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে॥

২৯। পৃঃ ১০৬ দ্রষ্টব্য।

আর কি সে রূপ ভুলি প্রেম তুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সে দিন ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে ॥—৩০ (গীতাবলী বা নিধু-
বাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৩১ ; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৬)

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে
কখন না পাসরিব জীবনে মরণে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৯)

তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মনঃ।
দেখিতে তাহার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন ॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন ॥—(ঐ, পৃঃ ১২৩)

প্রেম অনন্তগতি ; একবার ভালবাসিলে কখনও ভোলা যায় না—

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ মরি হে দুখেতে ॥—(ঐ, পৃঃ ২৮)

কিবা দিবা বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি
আঁখি অনিমিষ, পথ হেরিতে হেরিতে ॥—(ঐ, পৃঃ ৯)

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবে নিশি সেই ধ্যান সেই ধন সেই জ্ঞান
মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ করি ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৯)

প্রেম অন্তর কি হয় প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে। (ঐ পৃঃ ২৭)

কিন্তু এই প্রেমনিধি সর্ব্বত্যাগী না হইলে লাভ করা যায় না—

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে আছে যত অপমান ॥
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥
(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৩০)

প্রেম—লজ্জা-ভয়, মান-অপমানের অতীত। যে প্রেম-সঙ্গীতে কলঙ্ক বা কুলত্যাগের কথা আছে, চন্দ্রশেখর বাবু তাহা সমাজ-নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে

৩০। প্রীতিগীতিতে এই গানটি হরিমোহন রায়ের নামে আছে (পৃঃ ৫৩)। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকেও এই গানটি দেখা যায়। এই গানটি নিধু বাবুর কি না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কোন রসজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,৩১—"যাঁহারা এ দেশের প্রীতিগীতির ইতিবৃত্ত জানেন, তাঁহাদের নিকট এই কলঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবিদিত নাই।......বৈষ্ণব পদে যে কলঙ্কের উল্লেখ আছে, তাহা ভাগবতী লীলার অন্তর্ভূত। যদি ভগবান্‌কে চাও, তবে লোকাপবাদের ভয় করিলে চলিবে না। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিলে চলিবে না।· শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, কুল কোন্ ছার? কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মর্ম্ম, নিধুবাবু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন—

অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার।
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে॥
—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৮)

কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে অর্থ, সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের গানেও কলঙ্কের সেই অর্থ—প্রেমের জন্ম সর্ব্বস্ব ত্যাগ। শত অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার কি ঐকান্তিকতা! এই ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্যই কবি প্রেমের উপর কলঙ্ক আরোপ করেন। কবির এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমরা যেন কাব্যের জগতে সমাজ-নীতির বিতণ্ডা উপস্থিত না করি; তাহা হইলে আমরা কোন কালে কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না।" সেই জন্ম নিধু বাবু গাহিয়াছেন,—

হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে।
আমি বলি এত দিনে আইলেম কুলেতে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১২-১৩)

উল্লিখিত ভাবমূলক সঙ্গীত ছাড়াও নিধু বাবু প্রেম সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক টপ্পা রচনা করিয়াছেন। মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ, অভিমান, সাধনা, সোহাগ, আত্মনিবেদন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্য, উদ্বেগ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা, অনুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে। নিম্নোদ্ধৃত মিলন-সঙ্গীতটি যেন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেয়,—

আনন্দ ভর করি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মনসংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন-খঞ্জনে॥—(ঐ, পৃঃ ১৬০)

এরূপ চিত্রকুশলতার পরিচয় বিরল নয়—

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে॥

৩১। প্রীতিগীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ৩৵০।

যত ক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিক হেরিতে হেরিতে —(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৭)

মিলন—

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

আদর—

স আদরাদর যা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে অমিয় বচনে
শরীর শ্রবণ সুখী আঁখি সহিতে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪১)

প্রেমের তন্ময়তা—

যে দিকে চাই সে দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে ॥
যথন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে।
পুনঃ জাগরণে নয়নে নয়নে থাকি সেই মনে,
কি হলো আমারে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৬)

কিন্তু নিধু বাবু মিলনের এরূপ সুখ-চিত্র আঁকিলেও, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথাই বেশী বলিয়াছেন। মিলনের চেয়ে দুঃখের গান গাহিতে তিনি ভালবাসেন। প্রেমে সুখ-দুঃখ চিরন্তন—

ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল শর—(ঐ, পৃঃ ৭৭)

কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক—

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। হে
সুখ আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে ॥—(ঐ, পৃঃ ২)

মিলনেও দুঃখ, বিরহেও দুঃখ—

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদে মিলন আশে থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥—(ঐ, পৃঃ ১২০)

পথ চাহিতে চাহিতে দিন কাটিয়া যায়—

উদয় সুখতারা আমার নয়নতারা তার পথ নিরখিয়ে।
কারণ না জানি আমি আছি কি রসে ভুলিয়ে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩০)
এক পল বিপল না হেরি ওলো হতো মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥—(ঐ, পৃঃ ৬)

চক্ষের তৃষ্ণা মিটে না—

তিল অদর্শন হলে হয় সজল নয়ন—(ঐ, পৃঃ ৫)

নয়নের জলে মনের অনল নিভে না—

নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

হৃদয়ের আশাও কখন পুরে না—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো ॥—(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১১২, সঙ্গীতসারসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮৭৩ ; প্রীতিগীতি, পৃঃ ৩১৬)

কিন্তু দুঃখ-যাতনা সত্ত্বেও কবি প্রেমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেজো না।
যদি রাত্র দিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১৩১)

প্রেমের দহনে হৃদয় আরও নির্ম্মল হয়—

অন্ত অন্য চিন্তা যত আমার আছিল
তব হুতাশনে তারা শবদাহ হল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

দুঃখের ভয়ে প্রেম ভুলিতে পারা যায় না—

থাকিতে বাসনা যার চন্দনবনে।
ভুজঙ্গেরে ভয় সেহ করে কি কখনে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪৪)

প্রেমিকের কাছে প্রেমের দুঃখেও সুখ—

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারে লো রাখিতে।
দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৭)
পিরীতের দুঃখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।—(ঐ, পৃঃ ৯৪)

প্রেমের এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেও প্রেমিকের আশ্বাস—

দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ বোধ করে যতনে তায় তুষিব ॥
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন দূর থেকে দেখিব ॥—(বঙ্গের কবিতা, পৃঃ ২৯৫)
কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ২০)

উদ্ধৃত গীতসমূহ হইতে বুঝা যাইবে, নিধুবাবুর এই প্রেমের ধারণার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার প্রসারই অধিক। ইহাতে ভাবের গভীরতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তথাপি চন্দ্রশেখর বাবু ইহার মধ্যে "ইন্দ্রিয়লালসার আধিক্য", "উন্মুক্ত ও নির্লজ্জ বিলাসিতার ভাব" কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালীন গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুর প্রতিভা ও ক্ষমতা হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি ইঁহার কীর্ত্তিত প্রেমের "ইন্দ্রিয়লালসাতেই উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সমাপ্তি" ইত্যাদি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সমীচীন বলা যায় না।

আর একটি কথা। নিধুবাবুর গানগুলি গান হিসাবেও বিচার করিতে হইবে; সেগুলি

শুদ্ধ কবিতা বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অনেক সময় আমরা গানকে কবিতার মাপকাটীতে মাপিয়া ভুল করি; কবিতা ও গানে যে পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিয়া যাই। গানের প্রধান সৌন্দর্য্য সুর; সুরের ভিতর দিয়াই ইহা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। নিধুবাবুর প্রেমস্নিগ্ধ গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না, প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; তাহা শুনিবার জিনিস। শুধু নিধুবাবুর টপ্পায় কেন, এ কথা বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায়ও খাটে। সেই জন্য যাঁহারা রসজ্ঞ সুগায়ক কীর্ত্তনীয়ার মুখে মহাজন-পদাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মাধুর্য্য অধিকতর উপলব্ধি করিয়াছেন। নিধুবাবুর টপ্পাও গান; কবিতা হিসাবে শুধু তাহার সৌন্দর্য্য নহে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে; তবে নিধুবাবুর টপ্পার যে গান হিসাবেও যথেষ্ট মূল্য, তাহা সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমের মত গ্রন্থে নিধুবাবুর সার্দ্ধশতাধিক টপ্পার পুনর্ম্মুদ্রণ হইতে অনুমান করিতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ, ভারতবর্ষীয় গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুকে যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় স্থান দেন নাই, তাহাই তাঁহার রচনাগৌরবের পরিচায়ক।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজিকালিকার দিনে এরূপ শক্তিশালী গীতরচককে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি এবং তাঁহার টপ্পাগুলি অশ্লীল ও রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও অনাদরের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি, গুপ্ত কবি তাঁহার সময়েও এইরূপ বিরাগ লক্ষ্য করিয়া প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন,—"অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।" কিন্তু এত অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মধ্যেও নিধুবাবুর টপ্পা যে আজও বাঁচিয়া আছে, শুধু তাহাই ইহার জীবনী শক্তির পরিচায়ক। ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভাষার দুর্দ্দিনের সময় যে সকল যুগপ্রবর্ত্তনকারী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিধুবাবুও তন্মধ্যে একজন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই অনাড়ম্বর বাঙ্গালী কবি তৎকালে অবজ্ঞাত মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি,—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৯৮)

শ্রীসুশীলকুমার দে